৬

স্থান -- কলিকাতা, বাগবাজার

কাল -- (মার্চ?), ১৮৯৭

আজ দশ দিন হইল শিষ্য স্বামীজীর নিকটে ঋগ্বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। ম্যাক্সমূলর (Max Muller)-এর মুদ্রিত বহু সংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কিন বড়লোকের বাড়ি হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্যের পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামীজী সস্নেহে তাহাকে কখনও কখনও 'বাঙাল' বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনও ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখনও বা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

ঐরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর স্বামীজী ম্যাক্সমূলর-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন:

মনে হল কি জানিস -- সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলর রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমূলরকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পন্ডিত এ-দেশে দেখা যায় না! তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে রে! বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম -- কি যত্নটাই করেছিল! বুড়ো-বুড়িকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মতো দুটিতে সংসার করছে! আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়ছিল!

শিষ্য -- আচ্ছা মহাশয়, সায়নই যদি ম্যাক্সমূলর হইয়া থাকেন তো পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মিয়া ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মিলেন কেন?

স্বামীজী -- অজ্ঞান থেকেই মানুষ 'আমি আর্য, উনি ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি? -- তাঁর কাছে ও-সব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে-দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকান্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিসনি? -- East India Company (ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। এ-দেশে (ভারতের) শত শত বৈদিক পন্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ-দেশে এ-যুগে কেউ কি কখনও দেখেছে? ম্যাক্সমূলর নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript (পান্ডুলিপি) লিখেছেন; তারপর ছাপাতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপে লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নয়। এতেই বোঝ; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার 'বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে' -- সায়নের এই মত স্বামীজী সর্বথা সমর্থন করিয়া বলিলেন:

'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি, বেদপারগ ঋষিগণ ঐ-সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন

আমাদের মতো সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা -- পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি-মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কল্পেও এরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। এ-কথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।' বুঝলি?

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিস না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈরি হইবে?

স্বামীজী -- আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ -- এই ঘটটা ভেঙে-গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেন-না ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বতা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে ঐ-সকল জিনিসের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থসকলের সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহের সমষ্টিভূত ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তারই প্রকৃতস্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ 'ওঁ'কার আপনা-আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক-একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃত বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূলরূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম -- শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝলি?

শিষ্য -- মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতাছি না।

স্বামীজী -- জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নষ্ট হলেও ঘট-শব্দ থাকতে যে পারে, তা তো বুঝেছিস? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙেচুরে গেলেও তত্তদ্বোধক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, 'ঘট' 'ঘট' বলিয়া চিৎকার করিলেই তো ঘট তৈরি হয় না।

স্বামীজী -- তুই আমি ঐরূপে চিৎকার করলে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটন-ঘটন হতে পারে -- তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে 'ওঁ'কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা -- 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' বা 'গো, মানব, ঘট, পট' ইত্যাদি ঐ 'ওঁ'কার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক-একটা করে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়া ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি -- শব্দ কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য -- হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না।

স্বামীজী -- ধারণা হওয়া -- প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে, তখন একটার পর একটা করে এই-সব অবস্থার ভেতর দিয়ে গিয়ে শেষে নির্বিকল্পে উপসথিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায় -- জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর 'ওঁ'কারধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায় -- তারপর তাও শোনা জায় না।

তাও আছে কি নেই -- এরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। বস্ -- সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ-সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, নতুবা এমন বিশদভাবে এ-সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল -- নিজের দেখা-শুনা জিনিস না হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন: অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি-আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পশট হয়ে 'ওঁ'কার অনুভব করেন, 'ওঁ'কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রতক্ষ করেন। সামান্য সাধকেরা কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপে নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে-নিম্নভূমিতে -- সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায় -- 'ক্ষীরে নিরবৎ'।

এই-সকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপে অপূর্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন:

বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়'[১] এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু Terminology-র (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে।

এইবার গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন -- কি জি. সি., এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।

গিরিশবাবু -- কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, বুদ্ধিও নেই যে, ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ও-সব বেদবাদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও-সব পড়িয়া নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার নেই।

এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকান্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন -- জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্তে তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুন্ডাগুলো

---

[১] ন্যায়দর্শনের গ্রন্থবিশেষ

অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে -- এ-সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি? গিরিশবাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক হইয়া রহিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পন্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেন-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!

শিষ্য -- মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশবাবু -- জগতে এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত।

শিষ্য -- আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন, নিজে হৃদয়বান কি না! কিন্তু এই-সব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না; নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশবাবু -- বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দেখ না, তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পন্ডিত, তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তিনটে একই জিনিস? এই দেখ না, স্বামীজী অত পান্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদ-বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, সত্যই তো গিরিশবাবুর সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কি রে, তোদের কি কথা হচ্ছিল?

শিষ্য -- এই-সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন -- বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

স্বামীজী -- গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয় -- পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওর (গিরিশবাবু) মতো যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওকে (গিরিশবাবুকে) imitate (অনুকরণ) করতে গেলে অন্যের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখনও ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী -- আজ্ঞে হাঁ নয়। যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন। সদযুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলছে, এই-সব নিয়ে পথ চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝলি?

শিষ্য -- হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবাবু) বলিলেন, কি হবে ও-সব পড়ে? আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?

স্বামীজী -- আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই standpoint (দিক) থেকে আমাদের দু-জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে -- এই পর্যন্ত। একটা অবস্থা আছে, যেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে যায় -- 'মূকাস্বাদনবৎ'। আর একটা অবস্থা আছে, যাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এ-সব পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রতক্ষ হবে। বুঝলি?

নির্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশবাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, শুনিলেন তি স্বামীজী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।

গিরিশবাবু -- তা তুই করে যা। স্বামীজীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, ওরে এই জি. সি.-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?

সনানন্দ -- মহারাজ! জো হুকুম -- বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী -- প্রথমে ছোটখাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরিব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই -- এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ -- জো হুকুম, মহারাজ।

স্বামীজী -- জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায় -- 'মুক্তিঃ করফলায়তে'।

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

দেখ গিরিশবাবু, মনে হয় -- এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারো জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটিকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি -- এমন ভাব ওঠে?

গিরিশবাবু -- তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!

এই বলিয়া গিরিশবাবু কার্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।